কাশ্মীরে সংখ্যার রাজনীতিঃ গনভোট থেকে জনগণনা (১৯৯১-২০১১)

বিকাশ কুমার

২০ নভেম্বর, ২০২৩

জম্মু ও কাশ্মীরের জনপরিসংখ্যানের প্রতি সকলেরই যে তুমুল আগ্রহ, তা ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের বিতর্কিত সংযুক্তি এবং এই রাজ্যের কিছু অংশ পাকিস্তানের দখলে থাকার মতই পুরনো। সম্প্রতি, ২০১৯ সালে যখন ভারতীয় সংবিধানের যে ৩৭০ ধারাটির মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে স্বশাসনের অধিকার দিয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয় তখন এই আকর্ষণ আবার উজ্জীবিত হয়। জনসংখ্যার বিষয়টি জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, সে বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার গুণমান বিতর্কের বিষয়। সংখ্যার রাজনীতি, যা জনপরিসংখ্যানের বিষয়টিকে শুধু গঠনই করে না, তার দ্বারা গঠিতও হয় তা, বিশেষ করে ১৯৯১ ও ২০১১ সালের মাঝের সময়ের প্রেক্ষিতে, আরও বেশি মনোযোগ দাবি করে।

পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে ১৯৪৭ সালের পর, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে, একবার ১৯৫১ সাল ও আরেকবার ১৯৯১ সাল – এই দুইবার জনগণনা হয় নি। ২০০১ সালে ও ২০১১ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে আদমশুমারি পরিচালিত হলেও, কাশ্মীর উপত্যকায় স্বাধীনতা আনার সমর্থক গোষ্ঠীগুলির হস্তক্ষেপের কারণে এই পরীক্ষাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই গোষ্ঠীগুলির ভয় ছিল যে, নতুন দিল্লী হয়ত জনসংখ্যার হিসেবকে প্রভাবিত করতে চায়। জম্মু ও কাশ্মীর তিনটি ভারতীয় প্রশাসনিক বিভাগের দ্বারা গঠিত। এই তিনটি অঞ্চল হল, জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ। জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, কাশ্মীর বিভাগে, এবং সমগ্র রাজ্যের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী হল কাশ্মীরিভাষী মুসলিম। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে, একটি সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের সম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আক্রান্ত হওয়ার পর, কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী কাশ্মীর বিভাগ ত্যাগ করেন। হিন্দুরা জম্মুর সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, লাদাখের বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী মুসলিমরা উঠে এসেছেন।

কাশ্মীরিভাষী সুন্নি মুসলিম ও ডোগরিভাষী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হল যথাক্রমে কাশ্মীর ও জম্মুর দুই প্রধান গোষ্ঠী। ১৯৫০-রে দশক থেকে, এই দুই গোষ্ঠী রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী ব্যয় ও চাকরিতে বড় ভাগ পাওয়া নিয়ে একটি জিরো-সাম গেমে (খেলা বা অর্থনীতির এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যে অবস্থা দুটি পক্ষ জড়িত থাকে ও তাদের মধ্যে এক পক্ষ সমস্ত সুবিধা পায় ও অন্য পক্ষ সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়) জড়িয়ে পড়েছে (সরকারি সম্পদের অংশ পাওয়ার এই প্রতিযোগিতায় গুজ্জর, বকরোয়াল এবং পাহাড়িদের মত গোষ্ঠী খুবই সম্প্রতি অংশ নিয়েছে)। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয়ে এই গোষ্ঠীগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। তাদের দুশ্চিন্তার বিষয় ওই জনসংখ্যার ধর্মীয় আনুগত্য, কারণ ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ওই রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যাবে তা নির্ভর করছে মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠী কিভাবে তুলনামূলকভাবে বন্টিত হচ্ছে তার উপর। এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের সংযুক্তি নিয়ে একটি গণভোটের আয়োজনের মত একটি অসম্ভব দৃশ্য। পাকিস্তান সমর্থিত উপজাতীয় হানাদারদের আক্রমণের পর, সেই ১৯৪৮ সালেই ভারত যখন ইউনাইটেড নেশন্স সিকিওরিটি কাউন্সিল (ইউএনএসসি)-এর কাছে আবেদন জানায়, তখন ওই কাউন্সিলই এই প্রস্তাব রাখে।

এর ফলাফল হিসেবে, কাশ্মীর উপত্যকায় সংখ্যাসূচক প্রাধান্য হাসিল করার জন্য, প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং প্রশাসনিক নীতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবচ্ছেদ করে দেখা হয়। এই কারণে কাশ্মীর উপত্যকা – এবং ফলত, তার মুসলিম জনগোষ্ঠী বিধানসভায় অনেক বেশি সংখ্যক আসন পেয়ে থাকেন। তবে, গত কয়েক দশক ধরে এই সংখ্যাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অনেক বদল এসেছে। মর্দমশুমারি (জনগণনা) ও রাইশুমারি (গনভোট) – এই দুইয়ের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা তৈরি হইয়েছে এই উপত্যকায়, তাকে দিয়ে এই পরিবর্তনকে ব্যখ্যা করা যায়। এই পরিবর্তনশীল রাজনীতির তিনটি পুনরাবৃত্তিকে আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

১৯৯১ সালের জনগণনা

১৯৯১ সালে, বাকি দেশের সঙ্গেই জম্মু ও কাশ্মীরেও জনগণনা পরিচালনার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু, "অকুস্থলের পরিস্থিতি" পরিগণনার "সুযোগ" দেয় নি বলে, শুরুর তারিখের মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ওই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯০-৯১ সালে গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা উপত্যকার অন্দরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং লাদাখ ও জম্মুর অধিকাংশ জেলাই হিংসামুক্ত ছিল। তার উপর, জম্মু ও কাশ্মীরের মৃত্যুর হার, প্রতিবেশী রাজ্য পাঞ্জাব, যেখানে একই সময়ে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান ঘটছিল, তার চেয়ে অনেকটাই কম ছিল। তা সত্ত্বেও, পাঞ্জাবে জনগণনা ও নির্বাচন, দুইই সম্ভব হলেও, সারা জম্মু ও কাশ্মীরেই এই দুই কাজকে বন্ধ রাখা হয়। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীরা জনগণনার কাজকে হুমকি দেন এবং শ্রীনগরে জনগণনার কার্যালয়ে আগুন লাগান হলেও, যেহেতু ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রই আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল, তাই শুমারির কাজকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছিল কিনা, তা খুব স্পষ্ট নয়। গণঅভ্যুত্থানের তীব্রতা নয়, বরং সাধারণ প্রশাসনব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাই ১৯৯১ সালের জনগণনা বাতিল হওয়ার প্রাথমিক কারণ ছিল (২০০০-০১ সাল, অর্থাৎ গণঅভ্যুত্থানের সব চেয়ে হিংসাত্মক সময়েই অবশেষে জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়)।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সংঘটিত এই সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের কারণে নির্বাচন ও আদমশুমারি পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা দেখা যায় আর তার ফলে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ভিতরে ও বাইরে "অপদস্থ" হন। তাই, ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে, এই অঞ্চলে আবার জনগণনা শুরু করার জন্য এবং মুসলিম-প্রধান জম্মু ও কাশ্মীর সহ দেশের একটি সমষ্টিগত প্রতিকৃতি তুলে ধরার জন্য নতুন দিল্লি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক গণতন্ত্র হিসেবে ভারতের ভাবমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণনা ও নির্বাচনকে আবার শুরু করা অত্যাবশ্যক বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে ততদিনে, গণঅভ্যুত্থান ও তার মোকাবিলার জন্য, সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিঅভ্যুত্থান শুধু যে সরকারি সম্পদ সরবরাহকারী (পরিসংখ্যানের কাজ সহ) সাধারণ প্রশাসনকেই দুর্বল করে তোলে নি, তার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকেও গভীরতর করে তুলেছিল। এর ফলে, সরকারি সম্পদের বন্দোবস্তের বিষয়ে ঐক্যমত্য হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায়, একটি জনগণনা পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্বন্ধের ফলে, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য ঠিক কতটা সহজলভ্য, তা তার গুনাগুণের থেকে বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

২০০১ সালের আদমশুমারি

এই বৃহত্তর পটভূমিতে, ২০০০ সালে হিজবুল মুজাহিদিন (এমএইচ)-এর মত গণঅভ্যুত্থানকারী ও সশস্ত্র জঙ্গিদল আদমশুমারি বর্জন করার আহ্বান জানায় এবং তাতে অংশগ্রহণের বিষয়ে আধিকারিকদের সতর্ক করে। সরকারি কর্মচারীদের শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির অন্তত একজন নেতা, যতদিন না পর্যন্ত তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত জনগণনার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে তাঁর সংগঠনের সদস্যদের অনুরোধ জানান। এখানে জানা দরকার যে, ২০০০ সালের পয়লা অক্টোবরকে ২০০১ সালের জম্মু ও কাশ্মীরে জনগণনা শুরুর সম্ভাব্য দিন হিসেবে ধার্য করা হয়। তবে, এই বর্জনের আহ্বানের কারণে কাশ্মীর উপত্যকা এবং জম্মুর ডোডা জেলা জুড়ে জনগণনার কাজে তীব্র সমস্যা তৈরি হয়, এবং তার ফলে এই সম্ভাব্য তারিখকে এলোমেলোভাবে ও ধীরে ধীরে পিছিয়ে দেওয়া হয়।

সমসাময়িক ভাষ্যগুলি এই বর্জনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গণঅভ্যুত্থানের আরেকটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। তবে, এইচএইমের পক্ষ থেকে এই বর্জনের আহ্বানকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাঠ করা যায়। প্রথমত, এই আহ্বানকে যে কার্যকলাপগুলি নতুন দিল্লির সার্বভৌমত্বের দাবিকে স্বাভাবিক করে তোলে, সেগুলিকে বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে অস্বীকার করার পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, জম্মু ও কাশ্মীরের জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন, যা এই অঞ্চলের মুসলিম-প্রধান চরিত্রকে ধ্বংস করতে পারে, তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাম্প্রদায়িক আশঙ্কার প্রতিফলন এই বর্জনের আহ্বানের মধ্যে দেখা যায়। এই জাতীয় সুদীর্ঘ ও বৃহত্তর উদ্বেগ এই বর্জনের কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করলেও, যে উপাদানগুলি এই বর্জনের অংশ ছিল ও তাকে জারি করেছিল, সেগুলি ব্যাখ্যাতীতই থেকে যায়। এইখানেই, তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি প্রয়োজন। স্বাধীনতার পক্ষপাতী গোষ্ঠী ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি জায়মান আপোষের ছায়ায় স্বাধীনতার

সমর্থক দলগুলি ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়টি, ২০০১ সালের আদমশুমারির রাজনীতিকরণকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

এইচএমের একটি অংশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা হুরিয়ত কনফারেন্স, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের একটি আইনসম্মত জোট যা ভারত থেকে কাশ্মীরের পৃথকীকরণের সমর্থনে প্রচার চালায় ও উপত্যকার প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়, তাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। এইচএম ও হুরিয়তের মধ্যে, এই বিষয় নিয়ে, বেশ কিছু তীক্ষ্ণ বাক্যের বিনিময় হয়। যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে আক্রমণ না করে "মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে", তার উপর মনোযোগ দিতে এইচএম হুরিয়তকে পরামর্শ দেয়। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি হল, জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যাকে পালটে দেওয়ার জন্য আদমশুমারিকে ব্যবহার করা, যা এইচএম সকলের দৃষ্টিগোচর করে। দুই পক্ষই যদিও তাদের নিজেদের মধ্যে তৈরি হওয়া এই সমস্যাটি দ্রুত মিটিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু জনগণনার যে রাজনীতিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, তার আর সংশোধন সম্ভব হয় নি।

এই সময়ই, ২০০২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে গণঅভ্যুত্থান-বিরোধিতার বিষয়টি নিয়ে শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্স চিন্তিত ছিল। পঞ্চম পে কমিশনের সুপারিশের প্রচলন হওয়ার পরে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্বের পরিসর সীমিত হয়ে যায়। এর পাশাপাশি, স্বাধীনতার সমর্থক দলগুলির প্রতি নতুন দিল্লি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পেষ করা স্বাশাসনের অধিকার সংক্রান্ত একটি পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতিকে কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দেন। এই দুই ঘটনার ফলে যে চাপ তৈরি হয় তার মাঝেই ন্যাশনাল কনফারেন্স তার রাজনৈতিক জমি রক্ষা করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। সৈফ-উদ-দিন সোজ – একজন রাজনীতিবিদ, যিনি কয়েক বছর আগে, একটি হুইপ (অর্থাৎ কোনও গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে উপস্থিত থাকার লিখিত নির্দেশ) অগ্রাহ্য করায় এনসি থেকে বহিষ্কৃত হন, তিনি নিজেকে কাশ্মীরের প্রকৃত কণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণনার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করতে মনস্থ করেন। এইচএম বর্জনের আহ্বান জানানোর পরে, সোজ দুটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেন, যাতে তিনি জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের তথাকথিত ভীতিকে বিশদে বর্ণনা করেন।

সুতরাং, বিকাশমান শান্তি প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই, মূলধারার রাজনৈতিক দল এবং স্বাধীনতার সমর্থক শিবিরের অন্তর্গত নানা ধরনের অভিনেতা, তাঁদের সমর্থনের ঘাঁটিকে অভেদ্য করার উদ্দেশ্যে, রাজ্যের জনতাত্ত্বিক অবয়বের প্রতি তথাকথিত ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা উদ্দীপিত সাম্প্রদায়িক আবেগকে ব্যবহার করেছেন ।

২০১১ সালের আদমশুমারি

২০১১ সালের আদমশুমারির আগের দীর্ঘ প্রস্তুতিকালীন সময়টি ছিল ১৯৮০ ও ১৯৬০ সালের সময় ঘটা জনসংখ্যা বিষয়ক বিতর্কের স্মৃতিতে ভরা। কিন্তু এইবার, কাশ্মীরের জনসংখ্যাগত আধিপত্য অবমূল্যায়ণের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে ও রাজ্য আইনসভা এবং উন্নয়নের জন্য ধার্য তহবিলের হিস্যা পেতে, স্বাধীনতার সমর্থক দলগুলি এবার জনগণনায় (আর নির্বাচনেও) অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। এই ঘটনাকে কোনও অপ্রত্যাশিত ক্রমবিকাশ হিসেবে না দেখাই উচিত।

প্রথমত, ২০০১ সালের জনগণনার সময়েও, বিশেষ কিছু কাশ্মীরি সম্প্রদায় জনগণনার সমর্থন করেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী, যাঁদের উপস্থিতি এই রাজ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই গুজ্জর এবং বকরওয়াল উপজাতি যে "তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীর জনসংখ্যার প্রতি লক্ষণীয় আগ্রহ দেখান", তার কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য জনগণনার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরী। তবে, তাঁরা যে উদ্বেগগুলির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান, তার মধ্যে একটি হল যে, *ডি ফ্যাক্টো* প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (এর অর্থ, গণনার সময় ব্যক্তি সাধারণত যেখানে বাস করেন, সেই স্থানের অংশ হিসেবে তাঁকে গণনা করা হয়) গোষ্ঠীর যাযাবর অংশের সদস্যদের সংখ্যা কমিয়ে গণনা করা।

দ্বিতীয়ত, আগে ভারত রাষ্ট্রের বৈধতা নিয়ে অনেক আগে থেকেই এইচএমের বৃহত্তর দুশ্চিন্তার পাশাপাশি, এমনকি ২০০১ সালের জনগণনার উপর ওই দলের আক্রমণকেও, *পরিসংখ্যান* (ডি ফ্যাক্টো পদ্ধতির মাধ্যমে পরিযায়ীদের সংখ্যা কমিয়ে গণনা করার বিষয়ে উদ্বেগ) এবং *উন্নয়নের* (যদি কাশ্মীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়, তাহলে "মুসলিমদের উন্নয়নের পথে" বাধা সৃষ্টির ভয়) প্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে।

তৃতীয়ত, ভারতের রাজনৈতিকভাবে অস্থির এথনো-ভৌগলিক প্রান্তের একটা বড় অংশের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য, জনগণনার প্রক্রিয়ার প্রতি হিংস্র বিরোধিতার পন্থাতে একটা সাধারণ বদল আনা হয়েছে এবং সেই জায়গায় কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের মত রাজ্যে, ২০০১ সালে এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। দেশের প্রান্তের এই রাজ্যগুলি জুড়ে ঘটা এই পরিবর্তনকে, ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে সংঘটিত দুটি ঘটনার প্রেক্ষিত থেকে দেখা সম্ভব। একদিকে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষে, জাতীয়তাবাদী গণঅভ্যুত্থান পরিণত হয় পুনর্বন্টন নিয়ে আঞ্চলিক পরিচয়বাদী দ্বন্দ্বে। অন্যদিকে, অর্থনীতির উদারীকরণের পর রাষ্ট্র পিছু হটে যাওয়ায়, দেশের এই প্রান্তের অঞ্চল, যা এতদিন অর্থনৈতিকঅভাবে নিশ্চল ছিল এবং যেখানে সরকারি সংগঠনের নিরপেক্ষতার উপর বিশ্বাস খুবই কম, সেগুলির মধ্যে সরকারি সম্পদ আয়ত্তে আনার একটা তাড়া তৈরি হয়। অর্থাৎ, দেশের প্রান্তের এই অঞ্চলের তথ্যের ঘাটতি আসলে *গণতন্ত্র* ও *উন্নয়নের* অনুপস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১৯৯১-২০১১ সাল পর্যন্ত, আদমশুমারিকে ঘিরে এই পরিবর্তনশীল রাজনীতিকে, তাই মূলধারার রাজনীতির অভিনেতা ও স্বাধীনতাবাদী দলগুলির মধ্যের প্রতিযোগিতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রতিযোগিতা আবার অর্থনীতির উদারীকরণ ও স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি, যা অনেক খেলার নিয়মকে ঢেলে সাজিয়েছিল, তার দ্বারা পুনর্নির্ধারিত এক বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ঘাটিত হয়। আদমশুমারির পরিসংখ্যানের গুণমান ও সরকারি নীতির উপর জনতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের বাইরের এই ধরনের উন্নয়নের প্রভাবের গল্প অন্য সময় বলা যাবে।

বিকাশ কুমার ব্যাঙ্গালোরের আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি *নাম্বার্স অ্যাজ পলিটিক্সঃ দ্য সেন্সাস ইন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২৩)* বইটির লেখক।